BCS Syllabus on Bangladesh Affairs

❖ **The Constitution of the People's Republic of Bangladesh: Preamble, Features, Directive Principles of State Policy, Constitutional Amendments.**

Teacher's Discussion

❒ সংবিধান প্রনয়নের ইতিহাস

❒ রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি

Student Work

সংবিধান- সাধারণ বিষয়াবলী

সংবিধান

সংবিধান ঃ সংবিধান হল একটি রাষ্ট্রের দর্পণ বা প্রতিচ্ছবি। সংবিধান হল এমন এক বিশেষ দর্পণ যার মধ্যে একটি জাতির জীবন পদ্ধতি ফুটে উঠে। সাধারণত সংবিধান বলতে আমরা এমন কিছু নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান যা অনুশাসনকে বুঝি বা রাষ্ট্র পরিচালনার মূলসূত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এটিকে বলা হয় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন বা দলিল।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতামত ঃ

এরিস্টটলের মতে-'A Constitution is the way of life the state has chosen for itself.' আধুনিক মার্কিন সংবিধান বিশারদ ডাইসির মতে, 'সকল প্রকার নিয়ম-কানুন যা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অনুশীলন বা ক্ষমতার বণ্টনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে তাকে সংবিধান বলে।'

সংবিধান বিশেষজ্ঞ মার্কিন লেসলি লিপসন Democratic Civilization গ্রন্থে বলেন- 'সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রশাসনগত নিয়ম-প্রণালী ও তার সঙ্গে নাগরিকদের সম্পর্ক সংবলিত একটি রাজনৈতিক প্রকল্প। বলা বাহুল্য, এই প্রকল্পের মূল কাঠামো হলো লিখিত সংবিধান।'

লর্ড ব্রাইস বলেন, "রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনার জন্য আইন রীতিনীতির সমষ্টিকেই সংবিধান বলে"।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান যে, সংবিধান হলো কতিপয় নিয়ম-কানুন যা সরকার গঠন, দেশ পরিচালনা, সরকার ও জনগণের অবস্থান নির্ণয় এবং সর্বোপরি পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূলসূত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। সংবিধানের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের রূপ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। তাই সংবিধানকে বলা হয় 'রাষ্ট্রের দর্পণ'।

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রণীত ১৯৭২ সালের সংবিধান সমগ্র জাতির জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। পাকিস্তান যেখানে তার পৃথক সংবিধান রচনা করতে প্রায় নয় বছর (১৯৪৭-১৯৫৬) এবং ভারত প্রায় তিন বছর (১৯৪৭-১৯৪৯) সময় নেয়, সেখানে বাংলাদেশ মাত্র নয় মাসে (এপ্রিল'৭২- ডিসেম্বর' ৭২) জাতিকে একটি সংবিধান উপহার দিতে সক্ষম হয়। দেশের প্রখ্যাত আইন বিশেষজ্ঞ তৎকালীন সরকারের আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট "খসড়া সংবিধান প্রনয়ন কমিটি" বিভিন্ন মহলের ৯৮ টি সুপারিশের ভিত্তিতে ৭৪টি বৈঠকে ৩০০ ঘণ্টা সময়ে সংবিধান প্রনয়ন করেন। তারপর সংসদে মুক্ত বিতর্কের মাধ্যমে ৪ নভেম্বর ১৯৭২ বিপুল ভোটাধিক্যে-এটি গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ থেকে তা কার্যকর হয়।

সংবিধান রচনার বিভিন্ন ধাপ নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

ক) ১১ জানুয়ারী-১৯৭২ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক আদেশ জারি করেন। এ আদেশ অনুযায়ী একটি গণপরিষদ গঠিত হয়।

খ) ১৯৭০ এর নির্বাচনের জাতীয় পরিষদের (১৬৯ জন) ও প্রাদেশিক পরিষদের (৩০০) জন নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। পরবর্তীতে এর সদস্য সংখ্যা হয় ৪০৪ জন। এতে একমাত্র মহিলা সদস্য ছিলেন রাজিয়া বানু।

গ) ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ। স্পীকার ছিলেন শাহ আব্দুল হামিদ এবং ডেপুটি স্পীকার ছিলেন মোহাম্মদ উল্লাহ। এই অধিবেশনে ডঃ কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট "খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি" গঠিত হয়।

ঘ) ৪ নভেম্বর ১৯৭২ খসড়া সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয়।

Scanned by CamScanner

ঙ) ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭২ গণপরিষদের সদস্যবৃন্দ খসড়া সংবিধানে স্বাক্ষর করেন। অর্থাৎ এ দিন সংবিধান অনুমোদন হয়। তবে এতে ন্যাপ (মোজাফফর) এর সদস্য সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত স্বাক্ষর করা থেকে বিরত থাকেন।

চ) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়।

Teacher's Discussion | সংবিধানে মূলনীতি

০১। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানের বিধৃত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ বর্ণনা করুন। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনের প্রেক্ষিতে কি কি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে? (৩২তম বিসিএস)

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি (পঞ্চদশ সংশোধনীর আলোকে)

উত্তরঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংবিধানের অন্যতম অলংকার হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি। যে কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হলো জনসাধারণকে সর্বাধিক নাগরিক সুবিধা প্রদান করো। সে কারণে রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্রের সাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রকে সম্মিলিতভাবে বাস্তবায়ন করে গণতন্ত্রকে সফল করাই আধুনিক রাষ্টগুলোর প্রধান লক্ষ্য। এ কারণে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো তাদের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সংযোজন করে আসছে। তবে রাষ্ট্রগুলো প্রয়োজনে এসকল নীতি ও অন্যান্য বিষয় সংবিধানে সন্নিবেশিত বা প্রয়োজনে সংশোধন করতে পারেন। যেমনটা সংশোধিত হয়েছে বাংলাদেশ সংবিধানে।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কি

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলতে আমরা সেসব নীতিকে বুঝি, যা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক এবং বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে সহায়তা করে। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিকে আবার কর্মসূচিগত অধিকারও বলা হয়। কারণ এগুলো সরকারের বিবিধ কর্মকাণ্ড পরিচালনায় প্রেরণা যোগায়। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির সাংবিধানকি নিশ্চয়তা নেই। অর্থাৎ মৌলিক অধিকারের মতো এগুলোকে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়া হয়নি। মূলনীতিগুলোর বাস্তবায়ন নির্ভর করে একটি রাষ্ট্রের জাতীয় সম্পদ, জনগণের মেধা এবং অর্থনৈতিক সচ্ছলতার ওপর। সরকার এসব নীতি বাস্তবায়ন করে রাষ্ট্রের জনগণের কল্যাণ সাধন করার জন্য। সরকার এসব ক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখাতে না পারলে সরকারের বিরুদ্ধে এগুলো বাস্তবায়নের জন্য মামলা করা যাবে না, যেমনটি করা যায় মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সাধারণত সম্পদের অপর্যাপ্ততা এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। সে কারণে সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বাস্তবায়নে চেষ্টা করে কিন্তু বাস্তবায়নের গ্যারান্টি দেয় না।

১৯৭২ সালে সংবিধানে বিবৃত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সমূহ

১৯৭২ সালের রচিত সংবিধানের উল্লেখিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সমূহকে কয়েকটি ধাপে আলোচনা করা হলো ঃ

❐ রাষ্ট্রের ৪টি মৌলিক আর্দশ সম্পর্কিত নীতি ঃ

১. জাতীয়তাবাদ ঃ ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে, সেই জনগোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধতা বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। (*অনুচ্ছেদ ৯*)

২. সমাজতন্ত্র ঃ মানুষের ওপর মানুষের শোষণ থেকে মুক্ত ন্যায়ানুগ সমাজ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হলো রাষ্ট্রের লক্ষ্য। (*অনুচ্ছেদ ১০*)

৩. গণতন্ত্র ঃ বাংলাদেশ হবে একটি প্রজাতন্ত্র। এর রাজনৈতিক ব্যবস্থা হবে গণতান্ত্রিক। প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। (*অনুচ্ছেদ ১১*)

৪. ধর্মনিরপেক্ষতা ঃ ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ হলো সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার অবসান, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা না দেওয়া, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার না করা এবং ধর্মমের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বা নিপীড়নের অবসান। (*অনুচ্ছেদ ১২*)

❐ অর্থনৈতিক আদর্শ সম্পর্কিত নীতিসমূহ ঃ

Scanned by CamScanner

- **সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি ঃ** সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের উপর মানুষের যে শোষণ তা থেকে মুক্ত করে ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। *(অনুঃ ১০)*
- **কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি ঃ** কৃষক, শ্রমিক এর অনগ্রসর জনগণকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তির ব্যবস্থ করতে হবে। *(অনুঃ ১৪)*
- **মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ঃ** পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কর্মের অধিকারসহ মৌলিক উপকরণ নিশ্চিত করতে হবে। *(অনুঃ ১৫)*
- **গ্রামীন উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব ঃ** নগর ও গ্রামের জীবন যাত্রার মানের ক্রমাগত বৈষম্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে নিম্ন লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে-

(i) কৃষি বিপ্লবের বিকাশ ঘটাতে হবে
(ii) গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা করতে হবে
(iii) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে
(iv) কুটির শিল্প এবং অন্যান্য শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে।

– (অনুঃ ১৬)

- **অধিকার ও কর্তব্যরুপে কর্ম ঃ** যোগ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিককে কর্মের ব্যবস্থা হবে এটি হচ্ছে একজন নাগরিকের অধিকার আর রাষ্ট্র এটি ব্যবস্থা করবে এটি হচ্ছে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য। *(অনু ২০)*

❑ **সামাজিক আদর্শ সম্পর্কিত নীতিসমূহ ঃ**

- **জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা ঃ** জনগণের স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক দায়িত্ব হবে। পাশাপাশি স্বাস্থ্যের জন্য হানিকর যেমন- মাদক, মদ, ক্ষতিকর ভেষজ এ সকলের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে রাষ্ট্র কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। *(অনুঃ ১৮)*
- **অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ঃ** সমাজের প্রয়োজনের সাথে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করতে হবে, আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করতে হবে। *(অনুঃ ১৭)*

❑ **আইন ও শাসন ব্যবস্থার সংস্কার মূলক নীতি ঃ**

- **নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ ঃ** রাষ্ট্রের আইন ও নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত থেকে বিচারে বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করবে। ১ নভেম্বর ২০০৭ থেকে এটি কার্যকর হয়েছে।
- **জাতীয় সংস্কৃতি ঃ** রাষ্ট্র জনগণের সংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। *(অনুঃ ২৩)*
- **জাতীয় স্মৃতি নিদর্শন ঃ** ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বা তাৎপর্যমন্ডিত স্মৃতি নিদর্শনের বিনাশ, বিকৃতি বা অপসারণ হইতে রাষ্ট্র রক্ষা করবে। *(অনুঃ ২৪)*

সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে যেসব পরিবর্তন আনা হয়

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির চারটি মৌলিক আদর্শে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর নিজের ক্ষমতা দখল বৈধকরণের পাশাপাশি চারটি মৌলিক আদর্শের তিনটিতে পরিবর্তন আনেন। এ বিষয়ে তিনি চতুর্থ ফরমান জারি করেন, যা পঞ্চম সংশোধনীতে পাস করিয়ে নেয়া হয়। সংশোধন বা পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ :

❑ **৮(১)নং অনুচ্ছেদে পরিবর্তন ঃ**

১. **জাতীয়তাবাদ ঃ** 'বাঙালি' জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে 'বাংলাদেশী' জাতীয়তাবাদ করা হয়। তবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধরন বা ভিত্তি কি হবে সংশোধনীতে তার কোনো উল্লেখ করা হয়নি। ফলে নতুন জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে বিতর্ক রয়ে যায়।

২. **সমাজতন্ত্রে ঃ** সমাজতন্ত্রেও পরিবর্তন আনা হয়। এতে বলা হয় সমাজতন্ত্রের স্থানে হবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার এই অর্থে সমাজতন্ত্র।

৩. **ধর্মনিরপেক্ষতা ঃ** 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' প্রতিস্থাপিত হয়।

❑ **১২নং অনুচ্ছেদে বিলুপ্ত ঃ** সংবিধানের ১২নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টি বিলুপ্ত করা হয়।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে যেসব পরিবর্তন আনা হয়

Scanned by CamScanner

২০১১ সালের ৩০ জুন পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিতে নিম্ন লিখিত পরিবর্তন সাধিত হয় ঃ

❑ ৮(১)নং অনুচ্ছেদে পরিবর্তন ঃ

১. **জাতীয়তাবাদ ঃ** "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ" এর পরিবর্তে ১৯৭২ সালের সংবিধানে সন্নিবেশিত "বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ" ফিরিয়ে আনা হয়।
২. **সমাজতন্ত্র ঃ** "অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার এই অর্থে সমাজতন্ত্র" এটি পরিবর্তন করে ১৯৭২ সালের সন্নিবেশিত "সমাজতন্ত্র" প্রতিস্থাপন করা হয়।
৩. **ধর্মনিরপেক্ষতা ঃ** "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস" পরিবর্তন করে ১৯৭২ সালের সন্নিবেশিত "ধর্মনিরপেক্ষতা" প্রতিস্থাপিত হয়।

❑ **৯নং অনুচ্ছেদে পরিবর্তন ঃ** 'স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়ন' এর পরিবর্তে জাতীয়তাবাদ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

❑ **১০নং অনুচ্ছেদে পরিবর্তন ঃ** 'জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ' এর স্থলে 'সামজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি' প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

❑ **১২নং অনুচ্ছেদ পূর্ণবহাল ঃ** পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বিলুপ্ত ১২নং অনুচ্ছেদটি পূর্ণরায় বহাল করা অর্থাৎ বিলুপ্ত 'ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা' পূণরায় সংবিধানে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

উপসংহার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান উল্লিখিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে রাষ্ট্রের দায়িত্বের পাশাপাশি নাগরিকদের কর্তব্যের কথাও বলা হয়েছে। যদিও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলো রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক এবং বৈদেশিক সম্পর্ক নির্ধারণের সাথে সম্পৃক্ত, তবুও এগুলোকে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়া হয়নি। কিন্তু একেবারে অবহেলাও করা হয়নি। জাতীয় সংসদকে এ মূলনীতিগুলো কার্যকর করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ৪৭ অনুচ্ছেদে চমৎকার ব্যাখ্যা রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, কোনো সম্পত্তির রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ বা দখল, খনি সম্পর্কিত অধিকার বিলোপ বা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারে। তবে এই আইন প্রণয়ন বিষয়ে যদি উল্লেখ থাকে যে, তবে উক্ত আইন মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী হলেও বাতিল হবে না। সুতরাং ৪৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইনসভাকে মূলনীতি কার্যকর করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এবং সকল ক্ষেত্রে মূলনীতির ওপর মৌলিক অধিকারের প্রাধান্য নেই।

বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্ম নিরপেক্ষতার বিবর্তন

ধর্ম নিরপেক্ষতা

ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে এমন বিষয়কে বোঝায় যা কোনো ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলতে ঐ মতবাদকে বুঝায় যেখানে বিশ্বাস করা হয় যে, মানুষের আইন, শিক্ষা, রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি তথা রাজনীতি হবে প্রকৃত তথা বাস্তব ঘটনা ও বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার ভিত্তিতে, ধর্মের ভিত্তিতে নয়। এ মতবাদ অনুযায়ী ধর্ম এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভাজন থাকবে। ধর্ম ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকবে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্মের কোনো সম্পৃক্ততা থাকবে না। তাছাড়া ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে বস্তুবাদী দর্শনেরই ভিন্ন রূপ বলে মনে করা হয়। এতে বলা হয়, ব্যক্তির বস্তুগত স্বার্থ ও বিষয়াদিতে ধর্ম বা আদর্শগত বিষয়াদি সম্পৃক্ত থাকা অযৌক্তিক। তবে এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্ষমতাও সীমিত করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে ব্যক্তির ধর্মীয় বিষয়াদির ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার থাকবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে আমরা বোঝাতে পারি এমন রাষ্ট্রকে যেখানে কোনো ধর্মীয় বিষয়, অবস্থান বা নিয়মনীতির সাথে রাষ্ট্রের কোনো দাপ্তরিক সম্পর্ক থাকবে না ।

১৯৭২ সালের সংবিধান ও ধর্ম নিরপেক্ষতা

একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র, যেখানে তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ধর্মের ব্যবহার সীমিত করে একটি সর্বজনীন সরকার ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা গড়ে তোলা হবে- জনগণের এ প্রাণের দাবিকে পুঁজি করেই ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদসহ অন্যান্য নেতারা এবং পরবর্তীতে যুদ্ধ শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা হবে নবগঠিত স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মূল ভিত্তি। সে অনুযায়ী ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের যে নতুন সংবিধান রচিত হয় তার প্রস্তাবনায় বলা হয়, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের উচ্চতর আদর্শ, যা স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের বীরজনতাকে আত্মোৎসর্গ করতে এবং আমাদের বীর শহীদদেরকে জীবন বিসর্জন দিতে প্রণোদিত করেছিল, তা-ই সংবিধানের মূলনীতি।

আবার সংবিধানের ৮ (১) ধারায় বলা হয় যে, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি হবে রাষ্ট্রীয় নীতিমালার মূলনীতি। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে কার্যকর করার পন্থা হিসেবে বলা হয় যে, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিটি কার্যকর হবে-সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণের মাধ্যমে; খ) বিশেষ কোনো

Scanned by CamScanner

ধর্মকে রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো প্রকার বিশেষ মর্যাদা না দিয়ে; রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার রোধ করে এবং কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসারীর প্রতি যে কোনো ধরনের বৈষম্যরোধের মাধ্যমে। এ উদ্দেশ্যে মূল সংবিধানে সকল প্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল যাতে ধর্মকে কোনো প্রকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করা যায়। সংবিধানের ৩৮ ধারায় বলা হয়েছিল যে, কোনো সাম্প্রদায়িক বা অন্য কোনো সংগঠন বা সংঘ যা কোনো ধর্মের নামে বা কোনো ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত হয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলে লিপ্ত- এ ধরনের কোনো সংগঠন বা সংঘ গঠন বা এর সদস্য হওয়া বা এতে অংশগ্রহণের অধিকার কারো থাকবে না। এ ধারার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক সংগঠন-মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলাম, নিজামে ইসলামকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

ধর্ম নিরপেক্ষতার ১ম বিবর্তন- পঞ্চম সংশোধনী

১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতিতে আনীত পরিবর্তনসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১) বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনার ওপরে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সংযোজন করা হয়।

২) সংবিধানের চারটি মূলনীতির মধ্যে অন্যতম ছিল 'ধর্মনিরপেক্ষতা' (Secularism)। এ মূলনীতিটিকে বিলুপ্ত করে তার স্থলে 'পরম করুণাময় আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' সংযুক্ত করা হয়। (অনুচ্ছেদ ৮)

ধর্ম নিরপেক্ষতার ২য় বিবর্তন- অষ্টম সংশোধনী

অষ্টম সংশোধনী বিল বাংলাদেশের চতুর্থ সংসদের পাস করা আইনগুলোর অন্যতম। ১৯৮২ সালে ক্ষমতা পরিবর্তনের পর ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে নির্ধারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালের ৯ জুন জাতীয় সংসদে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী পাস হয়। এ সংশোধনী অনুযায়ী সংবিধানে ২ (ক) ধারা সংযোজনের মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

ধর্ম নিরপেক্ষতার ৩য় বিবর্তন- পঞ্চদশ সংশোধনী

২০১১ সালে ১৫তম সংশোধনীতে ধর্ম নিরপেক্ষতার বিষয়ে আনীত পরিবর্তনসমূহ হলো-

১) **প্রস্তাবনা সংশোধন ঃ** সংবিধানের প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহির-রাহমানির রহিম' ও এর বাংলা অনুবাদ 'দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহর নামে'-এর পাশাপাশি বিকল্প হিসেবে 'পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে' সংযোজনের পাশাপাশি প্রস্তাবনার প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে কয়েকটি শব্দের সংশোধন করে মূল সংবিধানের শব্দসমূহ প্রতিস্থাপন করা হয়।

২) **রাষ্ট্রধর্ম ও অন্যান্য ধর্ম এবং ধর্মের অপব্যবহার রোধ ঃ** সংবিধানের ২ক অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল রাখার পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মের মর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়। অনুচ্ছেদ ১২-এ ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়টি পুনর্বহাল করার পাশাপাশি অনুচ্ছেদ ৩৮ সংশোধন করে ধর্মের অপব্যবহার রোধ করা হয়।

৩) **৭২-এর সংবিধানের মূলনীতি বহাল ঃ** সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি পরিবর্তন করে ৭২-এর সংবিধানের মূলনীতি পুনর্বহাল করা হয়। একই সাথে ৮ (১ক) দফায় উল্লেখিত 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি' বিলোপ করা হয়। পাশাপাশি ৯ ও ১০ নং অনুচ্ছেদে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন এবং জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ স্থলে যথাক্রমে জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্ত বিষয়গুলো প্রতিস্থাপন করা হয়। বিলুপ্ত ১২ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টিকে পুনর্বহাল করা হয়।

Scanned by CamScanner

মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার

মৌলিক অধিকার ঃ মৌলিক অধিকার বলতে আমরা সেসব অধিকারকে বুঝি যা কোনো দেশের সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং যা বাস্তবায়নের ব্যাপারে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়া হয়। মৌলিক অধিকারগুলো সবই মানবাধিকার। তবে পার্থক্য এই যে, মানবাধিকারগুলোকে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়া হয় না। সুতরাং বলা যায় যে, যখন কতিপয় মানবাধিকারকে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করে তাদেরকে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়া হয় তখন এগুলোকে মৌলিক অধিকার বলে। সাংবিধানিক নিশ্চয়তা বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে, এসব অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত হলে সে ব্যক্তি আদালতের মাধ্যমে ঐ সব অধিকার ফিরে পাবে। আদালত তার রায়ের মাধ্যমে সরকারকে ঐ সব অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার হুকুম দিতে পারে।

মানবাধিকার ঃ মানুষ সমান মর্যাদা ও সমান অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং সকল মানুষই যে কোনো প্রকার পার্থক্য যেমন- জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নারী-পুরুষ, ভাষা, জন্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতাদর্শ, জাতীয় ও সামাজিক উৎপত্তি জন্ম বা অন্য মর্যাদা নির্বিশেষে সমান এবং সকল ধরনের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী- এটিই মানবাধিকারের মূলকথা। ১২১৫ সালে রাজা জনের স্বাক্ষরিত 'The Magna Carta' বিশ্বের ইতিহাসের প্রথম মানবাধিকার সনদ। তবে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বশেষ ফসল এবং মানবজাতির গুরুত্বপূর্ণ সনদ 'The Universal Declaration of Human Rights' বা সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা। এই সনদটি ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত হয়।

মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে পার্থক্য ঃ মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

১) **সংবিধানে লিপিবদ্ধ ও নিশ্চয়তা অর্থে ঃ** সকল মৌলিক অধিকারই মানবাধিকার। কিন্তু সকল মানবাধিকার মৌলিক অধিকার নয়। মৌলিক অধিকারগুলো সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকে এবং কোনো কোনো মৌলিক অধিকারকে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়া হয়। কিন্তু মানবাধিকার সংবিধানে ভিন্নভাবে লেখা থাকে না।

২) **উৎসগত পার্থক্য ঃ** মৌলিক অধিকারের উৎস মূলত কোনো দেশের সংবিধান। অর্থাৎ কোনো মানবাধিকার যখন সংবিধানে স্থান পায় তখন তাকে মৌলিক অধিকার বলে। অন্যদিকে মানবাধিকারের উৎস হলো আন্তর্জাতিক আইনের বিভিন্ন বিষয়।

৩) **অবস্থানগত পার্থক্য ঃ** মৌলিক অধিকারগুলো দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এক দেশের মৌলিক অধিকারের সাথে অন্য দেশের মৌলিক অধিকারের পার্থক্য থাকতে পারে। মানবাধিকারগুলো কোনো দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না হয়ে আন্তর্জাতিকতা লাভ করে অর্থাৎ মানবাধিকারকে ভৌগোলিক সীমারেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ রাখা যায় না।

৪) **সাংবিধানিক নিশ্চয়তা অর্থে ঃ** মৌলিক অধিকারকে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়া হয়। অর্থাৎ, কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে আদালত তার মৌলিক অধিকার বলবৎ করতে পারে। পক্ষান্তরে, মানবাধিকারগুলোর কোনো সাংবিধানিক নিশ্চয়তা নেই অর্থাৎ এগুলো আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়।

৫) **প্রযোজ্যতা ক্ষেত্রে ঃ** মৌলিক অধিকারগুলো একটি নির্দিষ্ট দেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে মানবাধিকারগুলো সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর প্রতিটি দেশের নাগরকিদের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।

বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার

বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ২৭ অনুচ্ছেদ থেকে ৪৪ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। সংবিধান প্রণেতাগণ শুধু বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্যই মৌলিক অধিকার প্রণয়ন করেননি, বরং বাংলাদেশে বিদেশী নাগরিকদের ব্যাপারেও গুরুত্বপূর্ণ ধারা সংযোজন করেছেন। মৌলিক অধিকার মোট ১৮ টি।

ক. শুধু বাংলাদেশের নাগরিকরা ভোগ করতে পারে এমন মৌলিক অধিকার ১২ টি।

১) **আইনের দৃষ্টিতে সমতা ঃ** সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। এই অনুচ্ছেদকে ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়, সকল ব্যক্তিই আইন দ্বারা সমভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে, কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়। সমপর্যায়ভুক্ত সকল ব্যক্তির প্রতি আইন সমান আচরণ করবে এবং সকলকে সমভাবে রক্ষা করবে। তবে ব্যক্তির কার্য ও দায়িত্বের ভিন্নতা থাকতে পারে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর কর্তব্য এবং অধিকার ভিন্ন হতে পারে। (অনুচ্ছেদ ২৭)

২) **ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ বৈষম্য করা যাবে না ঃ** ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না এবং উক্ত কারণে নাগরিককে সাধারণ বিনোদন ও বিশ্রাম কেন্দ্রে কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ বা ভর্তি হতে বঞ্চিত করা যাবে না। রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বস্তরে নারী ও পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে। তবে নারী, শিশু ও অনগ্রসর নাগরিকদের অগ্রগতির জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। (অনুচ্ছেদ ২৮)

৩) **চাকরির সমান সুযোগ ঃ** প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ থাকবে। আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিকদের মধ্যে রাষ্ট্রের চাকরিতে নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য করা যাবে না। (অনুচ্ছেদ ২৯)

৪) **বিদেশী রাষ্ট্রের উপাধি গ্রহণ ঃ** রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হতে কোন খেতাব, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করবে না (অনুচ্ছেদ-৩০)।

৫) **আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার ঃ** বাংলাদেশে অবস্থানরত সকল ব্যক্তি কেবল আইন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হবে এবং আইনের বিধি ছাড়া কারো জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি করা যাবে না। (অনুচ্ছেদ ৩১)

Scanned by CamScanner

৬) **চলাফেরার স্বাধীনতা ঃ** সকল নাগরিক বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধে চলাফেরা করতে পারবে। নাগরিকরা যে কোনো স্থানে বসবাস করতে পারবে এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও এ দেশে পুনঃপ্রবেশ করতে পারবে। এতে অবশ্য কিছুটা ব্যতিক্রমও আছে। সেটা হলো সরকার জনস্বার্থে চলাফেরার স্বাধীনতার ওপর যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারবে। (অনুচ্ছেদ ৩৬)

৭) **সমাবেশের স্বাধীনতা ঃ** জনশৃঙ্খলা বা জনস্বার্থের জন্য আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে বা নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে। (অনুচ্ছেদ ৩৭)

৮) **সংগঠনের স্বাধীনতা ঃ** জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংগঠন করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে। (অনুচ্ছেদ ৩৮)

৯) **বাক-স্বাধীনতা ঃ** সকলের চিন্তা ও বিবেকের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। এ অনুচ্ছেদে বাক-স্বাধীনতা ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছে। তাবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে রাষ্ট্র আইনের দ্বারা যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারবে। (অনুচ্ছেদ ৩৯)

১০) **পেশা ও বৃত্তির অধিকার ঃ** যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিক আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে যে কোনো আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণ করতে পারবে এবং যে কোনো আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারবে। (অনুচ্ছেদ ৪০)

১১) **ধর্মীয় স্বাধীনতা ঃ** ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, আইনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের যে কোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার থাকবে। প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার থাকবে। (অনুচ্ছেদ ৪১)

১২) **গৃহ ও যোগাযোগ রক্ষণ ঃ** প্রত্যেক নাগরিকের স্বীয় গৃহে নিরাপত্তা লাভের অধিকার থাকবে। এ অনুচ্ছেদের অর্থ দাঁড়ায় কারো গৃহে প্রবেশ করা, তল্লাশি করা এবং কাউকে আটক করা চলবে না। এছাড়া চিঠিপত্রের এবং যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমে গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে। তবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা বা জনস্বার্থের জন্য আইনের দ্বারা যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করা যাবে। (অনুচ্ছেদ ৪৩)

খ. বাংলাদেশে বসবাসকারী নাগরিক ও বিদেশীরা ভোগ করতে পারে এমন মৌলিক অধিকার ৬টি। যথা–

১৩) **জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার ঃ** বাংলাদেশে বসবাসরত সকল নাগরিক ও বিদেশী কেবলমাত্র আইন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হবে। আইনের ধারা ব্যতীত কারো জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। (অনুচ্ছেদ ৩২)

১৪) **গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ ঃ** কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের কারণ না জানিয়ে আটক রাখা যাবে না, কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির করতে হবে এবং আদালতের আদেশ ছাড়া তাকে আটক রাখা যাবে না। অবশ্য সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীতে বলা হয়, সরকার বিনা বিচারে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে আটক রাখতে পারবে। অবশ্য বিদেশী শত্রুর এই অধিকার প্রযোজ্য নয়। (অনুচ্ছেদ ৩৩)

১৫) **জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ ঃ** সকল প্রকার জবরদস্তিমূলক শ্রম নিষিদ্ধ। তবে ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য এই বিধি কার্যকর নয়। রাষ্ট্র জনগণের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আইনের দ্বারা বাধ্যতামূলক শ্রমের বিধান করতে পারবে। (অনুচ্ছেদ ৩৪)

১৬) **বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে বিধান ঃ** এ ধারায় বলা হয়েছে, যে সময়ে কোনো কার্য সংঘটিত হয়েছে সে সময়ে প্রচলিত আইনের বিধান লঙ্ঘন করা না হলে ঐ কার্যের জন্য কাউকেও দোষী করা যাবে না। এক অপরাধের জন্য এক ব্যক্তিকে একাধিকবার অভিযুক্ত করা যাবে না। ফৌজদারি অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচার লাভের অধিকারী। কোনো অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে বাধ্য করা যাবে না। কোনো ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেয়া যাবে না বা নিষ্ঠুর ও অমানুষিক দণ্ড দেয়া যাবে না। {অনুচ্ছেদ ৩৫ (১) (২) (৩) (৪) (৫)}

১৭) **ধর্মীয় স্বাধীনতা ঃ** আইন-শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিককে যে কোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রয়েছে এবং প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রয়েছে। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোনো ছাত্রকে নিজস্ব ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হবে না। (অনুচ্ছেদ ৪১)

১৮) **সাংবিধানিক প্রতিকার পাওয়ার অধিকার ঃ** মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য যে কোনো ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টে মামলা রুজু করতে পারে (অনুচ্ছেদ ৪৪)। সুপ্রিম কোর্ট কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে কোনো মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃকপক্ষকে আদেশ বা নির্দেশ দান করতে পারবে (অনুচ্ছেদ ১০২)। রাষ্ট্র মৌলিক অধিকারসমূহ লঙ্ঘন করে কোনো আইন প্রণয়ন করবে না। (অনুচ্ছেদ ২৬)

Scanned by CamScanner